মেনকা মালিক এবং অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০০৬ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৯৮)
২৮ শে আগস্ট, ২০১৮

[এন. ভি. রমনা এবং মোহন এম. শান্তনগৌদার, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩৪২, ৪৪৮, ৩২৫, ৩২৬, ৪৩৬, ৩৭৯, ৩০৭ এবং ৩০৩ - রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা - জনতার আক্রমণ - ধারালো ও ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার - ৫ জনের মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত - মামলার অভিযোগ ছিল যে অপরাধী পক্ষ এলাকার বাড়িতে ঢুকে পড়ে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এরপর অভিযোগকারী পক্ষের সদস্যদের উপর হামলা চালায় যার ফলে ৫ জন নিহত এবং ২৪ জন গুরুতর আহত হয় - সন্দেহের ভিত্তিতে বিচার আদালত কর্তৃক খালাস - হাইকোর্ট খালাসের আদেশে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি - খালাসের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর আপিল - স্থির করা হল ঃ নিম্ন আদালতের পর্যবেক্ষণ যে আঘাতগুলি অবশ্যই পদদলিত হয়ে পড়েছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ অভিযুক্ত পদদলিত হয়ে কেবল একটি দলের লোকেরই আহত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না - বৈপরীত্য এবং উন্নতিগুলি সামান্য প্রকৃতির ছিল - প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যে কিছু ছোটখাটো তারতম্য থাকা স্বাভাবিক, যখন বিপুল সংখ্যক লোক একটি ছোট দলকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল - এই পরিস্থিতিতে, প্রতিটি অভিযুক্তের সমস্ত কার্যকলাপ সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় - প্রাথমিকভাবে, এই সাক্ষীদের সামগ্রিক সাক্ষ্য নির্দোষ বলে মনে হয়েছিল - কিছু অতিরঞ্জন, উন্নতি এবং অলঙ্করণ পুরো রাষ্ট্রপক্ষের গল্পকে সন্দেহজনক করে তুলবে না - মামলায় ২৪ জনের মতো আহত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তাদের উপস্থিতি সন্দেহ করা যায় না - জেরা করার সময় আসামিপক্ষ ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিয়েও গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেনি - এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের রায় বিকৃত কিনা তা নির্ধারণে তার বিচারিক মন প্রয়োগ করেনি কারণ পুরো প্রমাণ বাতিল করা হয়েছিল, কেবল এই ভিত্তিতে যে কিছু সাক্ষী প্রথমবারের মতো আদালতের সামনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন –

হাইকোর্ট খুন ছাড়া অন্য অভিযোগের প্রমাণও মোটেই বিবেচনা করেনি - যদিও, ঘরবাড়ি পোড়ানো, বেআইনি সমাবেশ ইত্যাদির মতো প্রশ্নে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, তবুও এই প্রশ্নগুলির প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত দেয়নি - হাইকোর্ট এইভাবে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে তার পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে - আইন অনুসারে যোগ্যতার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি হাইকোর্টে প্রেরণ করা হয়েছিল

পুনর্বিবেচনা ঃ পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ - যেখানে বিচার আদালত বা আপিল আদালত কর্তৃক বস্তুগত প্রমাণ উপেক্ষা করা হয়েছে অথবা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সংশোধনমূলক এখতিয়ার হাইকোর্ট দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে - ১৮৬০

প্রমাণঃ সাক্ষ্যে অতিরঞ্জিততা বা অতিরঞ্জিততা-সাক্ষ্যের প্রামাণিক মূল্য – আদেশ করা হল ঃশুধুমাত্র অলংকরণ বা অতিরঞ্জনের কারণে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা যাবে না - উনো" তে "ফলসাস", " অমনিবাস" তে "ফলসাস", যার অর্থ "এক জিনিসে মিথ্যা, সবকিছুতে মিথ্যা" - এই মতবাদ ভারতীয় পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়, যেখানে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা সাধারণ - মতবাদ

প্রমাণ: চক্ষু এবং চিকিৎসা প্রমাণ - চক্ষু সাক্ষ্য এবং চিকিৎসা প্রমাণের মধ্যে দ্বন্দ্ব - চিকিৎসা প্রমাণ সাক্ষীদের চক্ষু সাক্ষ্যের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করতে পারে না - চক্ষু সাক্ষ্য প্রাধান্য পাবে - যেখানে চক্ষু সাক্ষ্যের বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, সেখানে বিকল্প সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে চিকিৎসা মতামত চূড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হয় না

ভারতের সংবিধান: ধারা ১৩৬ – এর পরিধি – প্রযোজ্য: হাইকোর্টের উপর ফৌজদারি কার্যবিধি. এর ধারা ৪০১(৩) এর অধীনে থাকা বিধিনিষেধ সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ৪০১(৩) এর অধীনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে না

আপিলের অনুমতি দিয়ে , আদালত

আদেশঃ ১. সুপ্রিম কোর্ট পুরো বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে পারে এবং ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ারের কোনও সীমাবদ্ধতা নেই একটি ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে আসার জন্য যদি এটি নির্ধারণ করে যে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিসঙ্গত ছিল না। সি আর পি সি এর এর ধারা ৪০১ (৩) এর অধীনে থাকা বিধিনিষেধ. হাইকোর্টের উপর সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

নির্মল সিং ১৯৯৬ এ. আই. আর এস. সি ১১৩৬: [১৯৯৬] ২ এস. সি. আর ১১৫; রাজস্থান রাজ্য বনাম ইসলাম (২০১১) ৬ এস. সি. সি ৩৪৩: [২০১১] ৬ এস. সি. আর ৯৮৮-এর উপর নির্ভরশীল।

২)যেসব মামলায় বিপুল সংখ্যক অপরাধী এবং বিপুল সংখ্যক ভুক্তভোগীর ঘটনা ঘটে, সেখানে কেবল দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ধারা ৫, ৭ এবং ১৪-এর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা বড় ধরনের অসঙ্গতি ছিল না। জেরা করার সময় আসামিপক্ষ ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিয়ে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করেনি। আদালতের সাক্ষীদের কাছ থেকে তোতাপাখির মতো জবানবন্দি দেওয়ার আশা করা উচিত নয়। তবে, প্রাথমিকভাবে, এই সাক্ষীদের সামগ্রিক প্রমাণ নির্দোষ বলে মনে হয়। এটাও স্পষ্ট যে এই সাক্ষ্যগুলি বস্তুগত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেমন ঘটনার দিন, সিপিআই(এম) কর্মীরা পি ডাবলু ২-এর বাড়িতে লুকিয়ে থাকা আইপিএফ কর্মীদের হুমকি দিয়েছিল। এরপর, সিপিআই(এম) কর্মীদের একটি দল বাড়ির বাইরে জড়ো হয়, লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিদের ধোঁয়া বের করার জন্য বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যখন তারা পি ডাবলু ৯-এর বাড়িতে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে, তখন সেই বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে, আইপিএফ সমর্থকরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল, যার ফলে সিপিআই(এম) এর লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ করে। সমস্ত সাক্ষী প্রতিটি বিবরণে একমত নাও হতে পারে, যেমন কে বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে এবং কে কোন অস্ত্র দিয়ে কাকে আঘাত করেছে ইত্যাদি। এটা সত্য হতে পারে যে তাদের জবানবন্দিতে অতিরঞ্জিত তথ্য পাওয়া গেছে যেমন মৃত ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ বিকৃত করা, যা মেডিকেল পরীক্ষায় অক্ষত পাওয়া গেছে। তবে, এই ধরনের অলঙ্করণ এবং অসঙ্গতিগুলি বিষয়টির মূলে যায় না। তুষ থেকে শস্য আলাদা করা আদালতের কর্তব্য। মামলায় ২৪ জন আহত প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন এবং তাদের উপস্থিতি সন্দেহের বাইরে।

মামলার ২৪ জন আহত প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করা যায় না।

মাসালতি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, এ আই আর ১৯৬৫ এসসি ২০২:[১৯৬৪] এস সি আর ১৩৩; নিসার আলী বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এ আই আর ১৯৫৭ এসসি ৩৬৬:[১৯৫৭] এস সি আর ৬৫৭; উগার আহির বনাম বিহার রাজ্য এ আই আর ১৯৬৫ এসসি ২৭৭; সুচা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৩) ৭ এস সি সি ৬৪৩: [২০০৩] ২ সম্পুরক এস সি আর ৩৫; নারায়ণ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (২০০৪) ২ এস সি সি ৪৫৫: [২০০৪] ২ এস সি আর ৮২; কামেশ্বর সিং বনাম বিহার রাজ্য, (২০১৮) ৬ এস সি সি ৪৩৩; কৃষ্ণ মোচি বনাম বিহার রাজ্য, (২০০২) ৬ এসসিসি ৮১: [২০০২] ৩ এসসিআর ১; রঞ্জিত সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৭৪) ৪ এসসিসি ৭৫২; পাঞ্জাব রাজ্য বনাম হরি সিং (১৯৭৪) ৪ এসসিসি ৫৫২ – নির্ভরযোগ্য ।

৩.১) যদিও বাড়িঘর পোড়ানো, বেআইনি সমাবেশ, ইত্যাদি প্রশ্নের ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, তবুও এই প্রশ্নগুলির প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং ট্রায়াল কোর্ট ও হাইকোর্টের পক্ষ থেকে কোনও ফলাফল পাওয়া যায়নি। ট্রায়াল কোর্ট বাড়িঘর পোড়ানো সম্পর্কিত সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করেছে, একমাত্র এই ভিত্তিতে যে পোড়া জিনিসগুলি আদালতে হাজির করা হয়নি। অন্যদিকে, পোড়া জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করে আদালতে হাজির করা হয়েছিল।

৩.২)বেআইনি সমাবেশ এবং বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিষয়টি বিবেচনা করলে, আদালত সাধারণত রেকর্ডে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে এই দিকগুলি নির্ধারণ করতে পারে। মামলায় ৩৬ জন প্রত্যক্ষদর্শী উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, অভিযুক্তরা সকলেই পি ডাবলু-২ এবং পি ডাবলু ৯-এর বাড়িতে দলবদ্ধভাবে এসেছিল এবং এই বাড়িগুলিতে আই পি এফ দলের লোকেরা জড়ো হয়েছিল তা পুরোপুরি জেনেও এই বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে, আদালত এই প্রমাণ থেকে বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য কল্পনা করতে পারে। আদালত আশা করতে পারে না যে বেআইনি সমাবেশ এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের বিষয়ে পৃথক প্রমাণ উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলা প্রমাণ করবে। যদি রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানের ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি খুঁজে বের করা যায়, তাহলে আদালত কেন এটি উপেক্ষা করবে তার কোনও কারণ নেই।

চোখের সাক্ষ্য ও চিকিৎসা প্রমাণের মধ্যে বিরোধের প্রসঙ্গে,হাইকোর্ট এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছে যে, ধারালো অস্ত্রের পাশাপাশি আঘাত করার সময় লাঠিও ব্যবহার করা হয়েছিল। তদ্ব্যতীত, এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সাক্ষীদের চোখের সাক্ষ্য চিকিৎসা প্রমাণকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম কৃষ্ণ গোপাল (১৯৮৮) ৪ এস. সি. সি. ৩০২: [১৯৮৮] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৩৯১-এর উপর নির্ভরশীল।

৪) যেখানে মূল প্রমাণাদি বিচারিক আদালত অথবা আপিল আদালত কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে, অথবা যেখানে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করে আদেশ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে উচ্চ আদালত পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমান মামলায়, বিচার আদালত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপেক্ষা করেছে এবং হাইকোর্ট ভুলভাবে মন্তব্য করেছে যে সাক্ষীরা প্রথমবারের মতো আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে। পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই আঘাতসমূহ হুড়োহুড়ির ফলে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যদি হুড়োহুড়ি সত্যিই হয়ে থাকে, তাহলে কেন কেবল একটি নির্দিষ্ট দলের লোকজনই আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। অতএব, প্রাথমিকভাবে রেকর্ডভুক্ত প্রমাণের আলোকে হুড়োহুড়ির তত্ত্বটি অভিযুক্তের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

শীতলা প্রসাদ বনাম শ্রী কান্ত (২০১০) ২ এস সি সি ১৯০ : [২০০৯] ১৬ এস সি আর ৬৮৬ – নির্ভরযোগ্য।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[১৯৯৬]২ এস সি আর ১১৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১১] ৬ এস সি আর ৯৮৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৬৪] এস সি ১৩৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৫৭] এসসি আর ৬৫৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
এআইআর ১৯৬৫ এসসিসি ২৭৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০০৩] ২সম্পুরক এসসি আর ৩৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০০৪] ২ এসসি আর ৮২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪

(২০১৮)৬ এসসিসি ৪৩৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০০২] ৩ এসসি আর ১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
(১৯৭৪) ৪ এসসিসি ৫৫২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
(১৯৭৪) ৪ এসসিসি ৭৫২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৮৮] ২সম্পুরক এসসি আর ৩৯১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২১
[২০০৯] ১৬ এসসি আর ৬৮৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৬ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৯৮।

২০০২ সালের সি.আর.আর. নং ৭৬৫-এ কলকাতা হাইকোর্টের ৩০.০৬.২০০৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

উপস্থিত দলগুলোর জন্য অনিল নৌরিয়া, শ্রীমতি সুমিতা হাজারিকা, দিবাকর ভট্টাচার্য, সুশ্রী ইপসিতা বেহুরা, জ্যোতির্ময় অধিকারী, ব্রিজ ভূষণ, শ্রীমতি পাঙ্খুরী শ্রীবাস্তব, রূপেশ কুমার, সুহান মুখার্জি, সুশ্রী আস্থা শর্মা, অমিত ভার্মা, শ্রীমতি কাজল দালাল (এম/এস পি এল আর চ্যাম্বারস অ্যান্ড কোম্পানির জন্য)। ।

'আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করেছিলেন

মোহন এম. শান্তনগৌদার, বিচারপতি ১) তাৎক্ষণিক আপিলটি ২০০২ সালের সি.আর.আর. নং ৭৬৫-এ কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ৩০শে জুন, ২০০৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখের বর্ধমানের দায়রা বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত দায়রা মামলা নং ৯১/১৯৯৮ (সেশনস ট্রায়াল নং ১০(৭)/২০০০) মামলায় খালাসের রায় নিশ্চিত করে।

২) সংক্ষেপে মামলার বক্তব্য হলো, ৩০.০৫.১৯৯৩ তারিখে কারান্দা গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সিপিআই(এম) দল জয়লাভ করে এবং আইপিএফ দল হেরে যায়। পরের দিন, অর্থাৎ ৩১.০৫.১৯৯৩ তারিখে, সকাল ৮:৩০ টায়, আইপিএফ দলের ১৫ থেকে ১৬ জন সদস্য তাদের দলের নেতা পি ডাবলু ২ বাদল মালিকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, যখন তাদের কিছু সিপিআই(এম) কর্মী তাদের ধাওয়া করে। দুপুর ১:৩০ টার দিকে, ভানু হাতি, কাচি হাতি এবং ভালুক হাতি (অভিযুক্ত নং ৫৬/উত্তরদাতা নং ৫৭) পি ডাবলু ৩, পি ডাবলু ৩০-এর স্ত্রী শ্যামলী পাকরে, আইপিএফ সমর্থক সুনীল পাকরে-কে গালিগালাজ করতে শুরু করে, যার প্রতিবাদে, সিপিআই(এম) সদস্যরা প্রায় ২৫০-৩০০ দলীয় কর্মীকে জড়ো করে, যাদের সকলের হাতে লাঠি, বালাম, টাঙ্গি ইত্যাদি অস্ত্র ছিল।

মামলার আরও অভিযোগ, সিপিআই(এম) দলের লোকেরা আইপিএফ সদস্যদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার মধ্যে দলের নেতা বাদল মালিকও ছিলেন। আইপিএফ সদস্যদের উপর হামলা চালায় এবং এলাকার বাড়িতে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এর পাশাপাশি ৭০০ টাকা চুরি করে এবং এক জোড়া সোনার কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। আইপিএফ সদস্যদের উপর হামলায় পাঁচজন নিহত এবং ২৪ জন গুরুতর আহত হন।

৩) প্রথম তথ্যপ্রদানের অভিযোগটি করা হয় মেনকা মালিক (পি ডাবলু ১ / বর্তমান আপিলকারী নং ১) কর্তৃক মেমারি থানায়, বর্ধমান জেলায়, যা ৩১/০৫/১৯৯৩ তারিখে ৮২/১৯৯৩ নম্বর মামলায় নথিভুক্ত হয়। এই মামলাটি দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩৪২, ৪৪৮, ৩২৫, ৩২৬, ৪৩৬, ৩৭৯, ৩০৭ ও ৩০২ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য রুজু করা হয়।

৪) উল্লিখিত ধারাগুলোর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়। মোট ৮২ জন অভিযুক্তের বিচার হয়। রাষ্ট্রপক্ষ এর পক্ষ থেকে মোট ৪৯ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়, যার মধ্যে ৩৬ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন, অর্থাৎ পি ডাবলু ১-২৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭। এই সাক্ষীদের মধ্যে পি ডাবলু ১৭ ও পি ডাবলু ১৮-এর সাক্ষ্য অভিযোগকারীর মামলার বিরোধী ছিল এবং পি ডাবলু ৪২ মানসিক অসুস্থতার কারণে ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন না বলে দাবি করেন।

৫) বিচারিক আদালত শুরুতেই নির্ধারণ করে যে, ৮২ জন অভিযুক্তের মধ্যে কেবল ৩২ জনের বিরুদ্ধেই জোরালো অভিযোগ রয়েছে এবং সেই ৩২ জনের বিরুদ্ধেই প্রমাণ পর্যালোচনার প্রক্রিয়া চালানো হয়। নথিভুক্ত উপাদানের মূল্যায়ন শেষে বিচার আদালত সমস্ত অভিযুক্তকে সন্দেহের সুবিধা দিয়ে খালাস প্রদান করে। আদালত উল্লেখ করে যে, রাষ্ট্রপক্ষ পক্ষ পাঁচজন ব্যক্তির মৃত্যু ধারালো ও অগ্রভাগযুক্ত অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম এফ আই আর কোনো উল্লেখ ছিল না—সেখানে কেবল দুইজন ব্যক্তির মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া আঘাতের কথাই বলা হয়েছিল;এফ আই আর -এ আক্রমণকারীদের নামও উল্লেখ করা হয়নি; বহু সাক্ষী আদালতে তাদের জবানবন্দি প্রদানকালে প্রথমবারের মতো অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বলে স্বীকার করেছেন; তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্যে উঠে আসে যে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে; পোড়া বস্তু উদ্ধার করা যায়নি ইত্যাদি। বিচার আদালত আরও উল্লেখ করে যে, চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রমাণ সাক্ষীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল, কারণ মৃতদের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও আহতদের চিকিৎসা প্রতিবেদন অনুযায়ী কাটা বা বিদ্ধ ধরনের আঘাতের অনুপস্থিতি দেখা যায়, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ এর পক্ষের সাক্ষীরা বলেছিলেন যে, মৃত ও আহতদের উপর টাংগি, বল্লম, কেঁচা ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

মামলার আরও অভিযোগ, সিপিআই(এম) দলের লোকেরা আইপিএফ সদস্যদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার মধ্যে দলের নেতা বাদল মালিকও ছিলেন। আইপিএফ সদস্যদের উপর হামলা চালায় এবং এলাকার বাড়িতে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এর পাশাপাশি ৭০০ টাকা চুরি করে এবং এক জোড়া সোনার কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। আইপিএফ সদস্যদের উপর হামলায় পাঁচজন নিহত এবং ২৪ জন গুরুতর আহত হন।

৬) বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে রাজ্য কোনও আপিল পছন্দ করেনি। তবে, প্রথম তথ্যদাতা অন্য তিনজনের সাথে হাইকোর্টের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার অধীনে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেছিলেন। পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানি চলাকালীন, পুনর্বিবেচনার আবেদনকারীদের পক্ষে জমা দেওয়া হয়েছিল যে ৮২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৪৮ জনের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা হয়নি, এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনটি কেবল বাকি ৩৪ জন অভিযুক্তের সাথেই করা হবে। এই মুহূর্তে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের সামনে যুক্তি চলাকালীন, আমাদের নজরে আনা হয়েছিল যে এই ৩৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৬ জন এখন মারা গেছেন।

৭) হাইকোর্ট মনে করে যে, বিচার আদালতের রায়ে কোনো বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, গুরুতর প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা আইনের ভুল প্রয়োগ ঘটেনি, যা সুস্পষ্ট অবিচারের সৃষ্টি করে এবং যার জন্য বিচার আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। যদিও হাইকোর্টের সামনে পুনর্বিবেচনার আবেদনের আবেদনকারীরা একাধিক যুক্তি উত্থাপন করেন, হাইকোর্ট শুধুমাত্র উপরোক্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি করে। অতিরিক্ত যে অনুসন্ধানটি করা হয়, তা হলো—বিচার আদালত যে পদ্ধতিতে অবৈধ সমাবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি নির্ধারণ করেনি, যা আপিলকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, সেটি মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানোর যথেষ্ট কারণ নয়। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে, প্রমাণ পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশনা বিচারিক বিচারকের মনে এই অনানুষ্ঠানিক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, হাইকোর্ট চায় নিম্ন আদালত একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাক, এবং এটি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে যেখানে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। হাইকোর্ট আরও মন্তব্য করে যে, বিচার আদালত নথি ভুক্ত প্রমাণের পরীক্ষাযোগ্য মান যাচাই করে, আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে অভিযুক্তদের খালাস প্রদান করেছে। হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা সম্পর্কিত কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করে। বাস্তবে, হাইকোর্টের রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষের মামলার গুণগত দিক, অন্তত প্রাথমিকভাবে, স্পর্শই করেনি, অর্থাৎ বিচারিক আদালতের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখেনি।

প্রাথমিক সংখ্যাঃ

৮) আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি। আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমরা হাইকোর্টের সংশোধন ক্ষমতা প্রয়োগ করে দোষী সাব্যস্ত করার রায়ের সাথে এই আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ সম্পর্কে যুক্তি চলাকালীন উত্থাপিত প্রাথমিক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে চাই। প্রশ্নটি আর অখণ্ড নয়, কারণ ধর্ম বনাম নির্মল সিং, (১৯৯৬) ৭ এসসিসি ৪৭১ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে ধারা ৪০১(৩) এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে না। এই উপসংহারে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল:

"৪) আমরা এই মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণগুলি পাঠ করে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে, অভিযুক্ত-প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত শ্রী ললিত যে একটি আইনি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেটি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য হলো, যেহেতু অভিযোগকারী হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা মামলায় গিয়েছিলেন এবং যেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০১ অনুযায়ী হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনা ক্ষমতার অধীনে হাইকোর্ট খালাসের সিদ্ধান্তকে দণ্ডাদেশে রূপান্তর করতে পারে না, কারণ ধারা ৪০১(৩)-এ এমনটাই বলা হয়েছে, তাই যদি আমরা মনে করি খালাসটি বেআইনিভাবে হয়েছে, তাহলে আমাদের এখতিয়ারে প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা পড়ে না; সর্বোচ্চ যা করা যেতে পারে তা হলো মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো। আমরা এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, কারণ এই আদালতে আসা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে। আমরা মনে করি না যে, ধারা ৪০১(৩)-এ যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে, তা আমাদের উপর প্রযোজ্য, যেহেতু আমরা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করছি। উল্লেখ করা যাক যে, একই ধরনের একটি যুক্তি শ্রী ললিত পূর্বেও উপস্থাপন করেছিলেন এ কে ছন্দ্রাসেনন বনাম কেরালা রাজ্য [(১৯৯৫) ২ এস.সি.সি. ৯৯ : ১৯৯৫ এস.সি.সি. (ফৌজদারি) ৩২৯ : জে.টি. (১৯৯৫) ১ এস.সি. ৪৯৬] মামলায়, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে এই আদালত দণ্ডবৃদ্ধির নির্দেশ জারি করার ক্ষমতাসম্পন্ন নয় যেমন পূর্ববর্তী কিছু মামলায় করা হয়েছিল। উপর্যুক্ত রায়ে বলা হয়েছিল যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬-এর অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা কোনো সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ নয়।"

৯) রাজস্থান রাজ্য বনাম ইসলাম, (২০১১) ৬ এস. সি. সি ৪৩-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত ধর্মার মামলার পূর্ববর্তী রায়ের উপর নির্ভর করে বলেছিল যে এই আদালত যদি মনে করে যে খালাস যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে নয়, তবে এটি পুরো উপাদানটি পর্যালোচনা করতে পারে এবং সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের এখতিয়ারের কোনও সীমাবদ্ধতা থাকবে না যাতে খালাস বাতিল করে ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে আসা যায়।

১০) উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে এটি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান যে, এই আদালতের পক্ষে সম্পূর্ণ উপাদান পর্যালোচনা করা উন্মুক্ত এবং অনুচ্ছেদ ১৩৬) অনুযায়ী এই আদালতের বিচার ক্ষমতার উপর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, যদি এই আদালত নির্ধারণ করে যে হাইকোর্টের মতামত যুক্তিসংগত ছিল না। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০১(৩) অনুযায়ী হাইকোর্টের উপর যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬ অনুযায়ী এই আদালতের ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। অতএব, আমাদের নির্ধারণ করতে হবে যে উপলব্ধ নথিপত্রের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের গৃহীত মতামত যুক্তিসংগত ছিল কি না।

প্রধান সমস্যাঃ

১১) বিচারিক আদালত তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় উল্লেখ করেছে যে, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী প্রথমবারের মতো বিচারিক আদালতের সামনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন, যেহেতু আদালতের সামনে সাক্ষীদের এমন বক্তব্যগুলি "উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন" হিসেবে ধরা হয়েছে; এই ধরণের বক্তব্য সাক্ষীরা তদন্ত চলাকালীন পুলিশের সামনে দেননি এবং আইন অনুযায়ী এই অপূর্ণতাগুলি প্রমাণিত হয়েছে। তবে, আমরা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য নিয়ে আমাদের বিবেককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। সেই উদ্দেশ্যে, আমরা সাক্ষীদের সাক্ষ্যপত্র পর্যালোচনা করেছি। যেহেতু আমরা এই রায়কে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তাই আমরা সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা না করে, উদাহরণস্বরূপ পি ডাবলু-৫, পি ডাবলু-৭ এবং পি ডাবলু-১৪ এর সাক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করব।

তদ্ব্যতীত, আমরা এই নীতিটির প্রতিও সচেতন যে, এই ধরনের মামলায় যেখানে বহু অভিযুক্ত ও বহু ভুক্তভোগী রয়েছেন, সেখানে মাত্র দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য যদি ঘটনাবলির একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ দেয়, তবে তা দণ্ডাদেশ বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট — যেমনটি এই আদালত মাসালতি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, এ আই আর ১৯৬৫ সুপ্রিম কোর্ট ২০২ মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছিল।

পি ডাবলু ৫, আন্না পাকরে, জবানবন্দি দিয়েছেন যে ঘটনার দিন, কিছু আইপিএফ কর্মী পিডব্লিউ২, বাদল মালিকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিছু সিপিআই(এম) কর্মীর হুমকির মুখে। কিছুক্ষণ পরে, হরিগোপাল গোস্বামী (এ-৮০/আর-৮১ এখানে), রাম তাহ (এ-৬৮/আর-৬৯ এখানে) এবং সত্য চক্রবর্তী (এ-৭১/আর-৭২ এখানে) সহ প্রায় ২০০-২৫০ জন সিপিআই(এম) কর্মী বাড়ির চারপাশে জড়ো হয়ে ভিতরে থাকা ব্যক্তিদের উপর গালিগালাজ করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর, হরিগোপাল গোস্বামী (এ-৮০/আর-৮১ এখানে), রাম তাহ (এ-৬৮/আর-৬৯ এখানে) এবং সত্য চক্রবর্তী (এ-৭১/আর-৭২ এখানে) সহ প্রায় ২০০-২৫০ জন সিপিআই(এম) কর্মী বাড়ির চারপাশে জড়ো হয়ে ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের উপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন। সিপিআই(এম) কর্মীরা ভানু হাতিকে (মৃত্যুর পর থেকে অভিযুক্ত হিসেবে অভিযুক্ত) বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে বলেন, যার ফলে লুকিয়ে থাকা লোকেরা ছুটে বেরিয়ে আসে এবং পি ডাবলু ৯, মন্টু মলের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, যেখানে কাচিহাটি (কার্তিক হাজরার উল্লেখ, এ-২৮/আর-২৯ এখানে) আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর, আইপিএফ কর্মীরা ঘর থেকে ঘরে ছোটাছুটি শুরু করে। দিলীপ পাকরে (মৃত), পি ডাবলু ৫-এর স্বামী, ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, সেই সময় জিতেন কোরা (এ-১/আর-এখানে), কেনা কোরা (এ-৭/আর-৮ এখানে), ভোলা মুখার্জি (এ-৭৭/আর-৭৮ এখানে), এবং সীতারাম মাকর (এ-৭০/আর-৭১ এখানে) তাকে টাঙ্গি, বোগি এবং কেঞ্চার মতো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেন। প্রণব বাউরি এ-৪০/আর-৪১ এখানে), দিলীপ পাকরেকে একটি বল্লাম দিয়ে আঘাত করেন। শক্তি গাদি (এ-১৫/আর-১৬ এখানে) তার মুখে প্রস্রাব করে দেন। এই মুহূর্তে, পি ডাবলু ৫ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর, তিনি তার সন্তানদের খুঁজতে গিয়ে রাধি কোরা (এ-৮/আর-৯ এখানে) একটি শাভোল দিয়ে এবং সান্তনা মাঝি (এখানে সনাতন মান্ডি, এ-৪৪/আর-৪৫ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে আক্রমণ করেন।পি ডাবলু ৫ আরও বলেছে যে মানিক হাজরা (মৃত) সুদেব হাতি (সুদেবহাজরার উল্লেখ, এ-৩০ /আর-৩১ এখানে) দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং রাজীব কোরা নামে একজন মানিক হাজরার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেছিল।

পি ডাবলু-৭ , নেমাইহাজরা একজন আহত সাক্ষী। তিনি জবানবন্দিতে বলেছেন যে, ঘটনার দিন, সিপিআই(এম) কর্মীদের হুমকির মুখে, তিনি, তার বড় ভাই মানিক হাজরা (মৃত), ১০ নম্বর পিডব্লিউ, উত্তম হাজরা, পি ডাবলু - ৩৩, উদয় হাজরা, একজন মদন হাজরা (মদৌহাজরাকে উল্লেখ করে) এবং নারায়ণ হাজরা (হরণস্বরূপ, ৩৯ নম্বর পি ডাবলু , হরায়নহাজরাকে উল্লেখ করে) বাদল মালিকের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সকাল ১১-১১.৩০ মিনিটে, লাঠি, রড, সবল, টাঙ্গি ইত্যাদি সজ্জিত প্রায় ১০০-১৫০ জন লোক কাছাকাছি জড়ো হয়, যার ফলে বাদল মালিক বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং আর ফিরে আসেননি। শীঘ্রই, বাইরের জনতা বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং বাড়িতে পাথর, ইটপাটকেল ইত্যাদি ছুঁড়তে শুরু করে। এরপর, তারা লুকিয়ে থাকা লোকজনকে ধোঁয়া দিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার ফলে ভেতরে লুকিয়ে থাকা লোকজন পি ডাবলু-৯ মন্টু মালের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, যদিও পি ডাবলু-৭ দুষ্কৃতকারীকে দেখতে পায়নি। লুকিয়ে থাকা লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তাদের উপর হামলা শুরু হয়। পি ডাবলু-৭-কে সুদেব হাজরা (এ-৩০/আর-৩১) টাঙ্গি দিয়ে, জয়দেব হাজরা (এ-২৯/আর-৩০) লোহার রড দিয়ে, সীতারাম মকর (এ-৭০/আর-৭১) লাঠি দিয়ে, সাধন সোমে (এ-৭৮/আর-৭৯) লাঠি দিয়ে এবং বেচা দুলে (এ-৬৭/আর-৬৮) লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে।

তার জেরা চলাকালীন, পি ডাবলু-৭ উল্লেখ করেন যে তিনি ঘটনাটির কোনো উসকানির বিষয়ে জানতেন না। তিনি আরও বলেন যে প্রায় ৪০-৫০ জন ব্যক্তি বাদল মালিকের বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে পড়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে জনতার দ্বারা তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হন এবং তিনি ৮-১০টি লাঠির আঘাত, একটি রডের আঘাত পান এবং তাঁকে টাঙ্গি, সাবল ইত্যাদির দ্বারা আঘাতও করা হয়।

পি ডাবলু-১৪, শুভদ্রা মালিক, মৃত মানিক হাজরার মা এবং পি ডাবলু-২, বাদল মালিকের মা। তিনি সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘটনার দিনে মানিক হাজরা এবং একাধিক আই পি এফ সমর্থক সিপিআই(এম) কর্মীরা আই পি এফ কর্মীদের হুমকি দিতে শুরু করলে বাদল মালিকের বাড়িতে আশ্রয় নেন, যেখানে পি ডাবলু-১৪ নিজেও বাস করতেন। এরপর বহু সিপিআই(এম) কর্মী বাড়িটি ঘিরে ফেলেন। ভানু হাঁটি ও তার ছেলে ভালুক হাঁটি (এ-৫৬ / আর-৫৭) বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং পিতার নির্দেশে ছেলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন। ধোঁয়ায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়ে, আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিরা পি ডাবলু-৯, মন্টু মাল-এর বাড়িতে আশ্রয় নেন, যেটিও কাচি হাঁটি (সম্ভবত কার্তিক হাজরা, এ-২৮ / আর-২৯) আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। আই পি এফ সমর্থকরা একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন এবং তখনই তাঁদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। সীতারাম মাকর (এ -৭০ / আর-৭১), অভয় রায় (এ-৬৯ / আর-৭০), শক্তি দুলুই, জয়দেব দুলুই, জয়দেব হাঁটি (জয়দেব হাজরা, এ-২৯ / আর-৩০), সুদেব হাঁটি (সুদেব হাজরা, অভিযুক্ত-৩০ / আর-৩১), খুদি তাহ, গণেশ ক্ষেত্রপাল (এ-৩৯ / আর-৪০), প্রমোদ ক্ষেত্রপাল ও অঙ্গদ ক্ষেত্রপাল দিলীপ পক্রের উপর হামলা চালান। প্রণব পক্রে একটি বল্লম দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত করেন। সোনা (সম) কোড়া (মৃত) এর উপর সীতারাম (এ-৭০ / আর-৭১), অভয় রায় (এ-৬৯ / আর-৭০), জয়দেব (এ-২০ / আর-২১), সুদেব হাঁটি (সুদেব হাজরা, এ-৩০ / আর-৩১), জয়দেব হাঁটি (জয়দেব হাজরা, এ-২৯ / আর-৩০) এবং অন্যান্যরা আক্রমণ চালান। সাধন নায়ক (মৃত) কে পি ডাবলু-৯ মন্টু মাল-এর বাড়ি থেকে টেনে বের করে সীতারাম (অভিযুক্ত-৭০ / আর-৭১), অভয় (এ-৬৯ / আর-৭০) ও অন্যান্যরা মারধর করেন। সুও কোড়া (এ-৫৩ / আর-৫৪) কুঠার দিয়ে সাধনকে আঘাত করে হত্যা করেন। মানিক হাজরা (মৃত) কে সীতারাম (এ-৭০ / আর-৭১) একটি বল্লম দিয়ে, এবং সুদেব হাঁটি (সুদেব হাজরা, এ-৩০ / আর-৩১) সাবল দিয়ে আঘাত করেন, যার ফলে তিনি মারা যান। সুদেব তাঁর মলদ্বারে একটি সাবল প্রবেশ করান। রাজীব কোড়া মানিকের পুরুষাঙ্গ কেটে দেন একটি বঁটি দিয়ে। পি ডাবলু-১৪ আরও সাক্ষ্যে বলেন যে, তাকেও সুদেব তাহ, কেনা বাগদি ও অন্যান্যরা লাঠি দিয়ে মারধর করেন, যার ফলে তিনি জ্ঞান হারান। তাঁর আঘাতের কারণে তিনি অনেকদিন হাসপাতালে ছিলেন। তাঁর জেরা চলাকালীন তিনি বলেন, তিনি এই সব বিষয় তদন্তকারী অফিসারকে বলেছিলেন কিনা তা স্মরণে নেই।

১২) আমরা এই সমস্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনি। কোনও বড় দ্বন্দ্ব বা বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না।

জেরা চলাকালীন ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণের মধ্যে কিছু ছোটখাটো বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক, যখন একটি ছোট গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো হয়েছিল এবং যার ফলে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং ২৪ জন আহত হয়েছিল।এই পরিস্থিতিতে, প্রতিটি অভিযুক্তের সমস্ত কার্যকলাপ সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। আদালতের সাক্ষীদের কাছ থেকে তোতাপাখির মতো সাক্ষ্য দেওয়ার আশা করাও উচিত নয়। তবে, প্রাথমিকভাবে, এই সাক্ষীদের সামগ্রিক প্রমাণ নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে।

১৩) এটাও স্পষ্ট যে উপরোক্ত সাক্ষ্যগুলিতে মূল বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে, যেমন—ঘটনার দিনে সিপিআই(এম) কর্মীরা আই পি এফ কর্মীদের হুমকি দিয়েছিল, যারা পি ডাবলু-২ বাদল মালিকের বাড়িতে লুকিয়ে পড়েছিলেন। এরপর সিপিআই(এম) কর্মীদের একটি জনতা ওই বাড়ির বাইরে জড়ো হয়, এবং লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিদের বের করতে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। তারা যখন পি ডাবলু-৯ মন্টু মাল-এর বাড়িতে লুকাতে যান, তখন সেই বাড়িটিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে, আই পি এফ সমর্থকেরা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন, তখনই তাঁদের উপর সিপিআই(এম) কর্মীরা আক্রমণ চালান। সব সাক্ষীর বক্তব্য প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে একরকম না-ও হতে পারে, যেমন—কে বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল, কে কাকে কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল ইত্যাদি। এটা ঠিক হতে পারে যে, তাঁদের বয়ানে অতিরঞ্জন ছিল—যেমন মৃত মানিক হাজরার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার কথা বলা হলেও চিকিৎসা পরীক্ষায় তা অক্ষত পাওয়া গেছে। কিন্তু এই ধরনের অলংকরণ ও অসামঞ্জস্য ঘটনাটির মূল বিষয়কে প্রভাবিত করে না। উপরন্তু, রেকর্ডে থাকা উপাদান থেকে দেখা যায় যে, যদি কোনো পরিবর্তন থেকে থাকে, তা শুধুমাত্র ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্ষেত্রে হয়েছে, আক্রমণের ঘটনার ক্ষেত্রে নয়। যদি কোনো পরিবর্তন থেকে থাকে, যা প্রথমবার আদালতে বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলোকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শুধুমাত্র এই কারণে সাক্ষীদের পুরো বক্তব্যকেই উপেক্ষা করতে হবে।

১৪)এই আদালত নিসার আলী বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, এ আই আর ১৯৫৭ এস সি ৩৬৬, উগারআহির বনাম বিহার রাজ্য, এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ২৭৭, সুচা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (২০০৩) ৭ এস সি সি ৬৪৩, নারায়ণ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (২০০৪) ২ এস সি সি ৪৫৫ এবং কামেশ্বর সিং বনাম বিহার রাজ্য, (২০১৮) ৬ এস সি সি ৪৩৩ এর মতো বেশ কয়েকটি রায়ে এই মতবাদের অপ্রযোজ্যতা সমর্থন করেছে। কৃষ্ণ মোচি বনাম বিহার রাজ্য, (২০০২) ৬ এস সি সি ৮১ মামলায়, এই আদালত ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই মতবাদ প্রয়োগের বিপদগুলি তুলে ধরেছে।

"৫১....."ফ্যালসাস ইন উনো, ফ্যালসাস ইন ওমনিবাস" (একটিতে মিথ্যা, সর্বত্র মিথ্যা) এই সর্বোচ্চ বিধির ভারতের আইনে কোনও প্রয়োগ নেই এবং শুধুমাত্র আংশিক মিথ্যা বলার কারণে কোনও সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। "ফ্যালসাস ইন উনো, ফ্যালসাস ইন ওমনিবাস" সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি, এবং এটি কোনও আইনগত নীতিতে পরিণতও হয়নি। এটি কেবলমাত্র একটি সতর্কতামূলক নীতি। এর মানে শুধুমাত্র এতটুকুই যে, এরকম পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা উপেক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু তা উপেক্ষা করতেই হবে—এইরকম কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। এই নীতি সাক্ষ্যের ওজন মূল্যায়নের একটি দিকমাত্র, যা আদালত নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে। এটি কোনও "বাধ্যতামূলক প্রমাণবিধি" নয়। (দেখা যাবে : নিজার আলি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য [এ আই আর ১৯৫৭ সুপ্রিম কোর্ট ৩৬৬ : ১৯৫৭ ক্রিমিনাল এল জে ৫৫০])। এই নীতিটি বিশেষ করে ভারতের প্রেক্ষিতে একটি বিপজ্জনক নীতি, কারণ যদি কোনও সাক্ষী একটি বিষয়ে অসত্য বলার কারণে তাঁর সমগ্র সাক্ষ্যই বাতিল করা হয়, তাহলে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা কার্যত স্থবির হয়ে পড়বে। সাক্ষীরা প্রায়ই কাহিনিতে অলংকরণ বা অতিরঞ্জন যোগ করেন, যদিও মূল ঘটনা সত্য হতে পারে। সেজন্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচার করতে হয় সেই সাক্ষ্যের কতটা অংশ গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে আদালত যদি সাক্ষ্যকে অপর্যাপ্ত মনে করে, তাহলেই তার সমগ্র সাক্ষ্য বাতিল করতে হবে—এমন কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। সাক্ষ্যকে সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করতে হয়। উপরোক্ত নীতিটি (ফ্যালসাস ইন উনো, ফ্যালসাস ইন ওমনিবাস) একটি সঠিক নিয়ম নয়, কারণ খুব কমই এমন কোনও সাক্ষী পাওয়া যায় যার সাক্ষ্যে সামান্যতম মিথ্যা, অতিরঞ্জন বা অলংকরণ না থাজাব (দেখা যাবে: সোহরাব বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য [(১৯৭২) ৩ এস সি সি ৭৫১ : ১৯৭২ এস সি সি (ফৌজদারি) ৮১৯] এবং উগর আহির বনাম বিহার রাজ্য [এ আই আর ১৯৬৫ সুপ্রিম কোর্ট ২৭৭ : (১৯৬৫) ১ ফৌজদারি এল জে ২উজদার সঠিকভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে হবে, যেন—একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে বললে—"চাল থেকে ভূষি পৃথক করা যায়", অর্থাৎ, সত্যকে মিথ্যার থেকে আলাদা করা যায়।

১৫) কিন্তু শুধুমাত্র কিছু অতিরঞ্জন, উন্নতি এবং অলঙ্করণ থাকার কারণে, সমগ্র মামলার গল্পটি সন্দেহ করা উচিত নয়। রঞ্জিত সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৭৪) ৪ এস সি সি ৭৫২ মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"২৬) এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যখন অতিরঞ্জন এবং অলঙ্করণের পরিমাণ বেশি থাকে, তখনও আদালত সত্য আবিষ্কারের লক্ষ্যে একটি 'ফরেনসিক' অনুশীলন করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়। এই ঘটনায় বিপুল সংখ্যক লোক জড়িত ছিল, যাদেরকে এখন হাইকোর্ট খালাস দিয়েছে, এই সত্যটি হাইকোর্টকে নথিতে থাকা প্রমাণের প্রশংসা করতে এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন বিষয়গুলিকে বাতিল করতে এবং আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে এমন বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে এবং তার উপর নির্ভর করতে বাধা দেয়নি। এই অনুশীলনটি 'বৈধ' ছিল কারণ অন্যথায় আদালতকে 'তিক্ততা থেকে তৈরি' বিকৃতি এবং/অথবা অলঙ্করণের কাছে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে দেখা হত, তা সে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দ্বারা নিম্নমানের তদন্ত সহ অন্য কোনও কারণেই হোক না কেন। আদালতের 'সর্বদা সত্য আবিষ্কার' এর চূড়ান্ত অনুসন্ধান রয়ে গেছে এবং যদি না আদালত কোনও নির্দিষ্ট মামলায় সেই অনুশীলনকে বাধাগ্রস্ত করার অসুবিধায় এতটা হতাশ না হয়, যার ফলে সেই বিষয়টি অনুসরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে তাকে সেই দিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।"

পঞ্জাব রাজ্য বনাম হরি সিং (১৯৭৪) ৪ এস. সি. সি ৫৫২ মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

১৬)যেহেতু পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনার বিভিন্ন ক্ষমতার ফলে প্রাপ্ত মানব সাক্ষ্য অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ এবং এমনকি সত্যবাদী সাক্ষীরাও খুব কমই অতিরঞ্জিত বা কল্পনাপ্রসূত বা অর্ধসত্য বলে, তাই আদালতকে অবশ্যই সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে সত্যের মূল অংশ বের করে আলাদা করার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রবাদ বাক্যটির অর্থ এই যে, আদালতকে "শস্য থেকে তুষ আলাদা করতে হবে"। যদি, সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়াই, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সত্যের একটি অবশিষ্টাংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আদালতগুলি এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে কার্যকর করতে বাধ্য এবং সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক এবং অনুমানমূলক ভিত্তিতে তা উড়িয়ে দিতে বাধ্য নয়।"

১৬) অতএব, এটা সন্দেহ করা যায় না যে ভুঁড়ি থেকে ভুঁড়ি আলাদা করা আদালতের কর্তব্য। উপরন্তু, প্রমাণের ছোটখাটো বৈচিত্র্য বিষয়টির মূলকে প্রভাবিত করবে না, যেহেতু এই ধরনের ছোটখাটো বৈচিত্র্যকে বড় গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যেহেতু তারা সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণ/বিশ্বাসযোগ্যতাকে বস্তুগতভাবে পরিবর্তন করবে না।

১৭) উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, প্রাথমিকভাবে, আমরা নথি থেকে দেখতে পাই যে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অবিশ্বাস্য বলা যাবে না, বিশেষ করে মাসাল্তির মামলায় (উপরে উল্লেখিত) এই আদালতের পর্যবেক্ষণের আলোকে। মামলায় ২৪ জন আহত প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন এবং তাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট বিচার আদালতের রায় বিকৃত কিনা তা নির্ধারণে তার বিচারিক মন প্রয়োগ করেনি কারণ সম্পূর্ণ প্রমাণ বাতিল করা হয়েছিল, কেবল এই ভিত্তিতে যে কিছু সাক্ষী প্রথমবারের মতো আদালতের সামনে জবানবন্দি দিয়েছিলেন।

১৮) কৌতূহলজনকভাবে, হাইকোর্ট হত্যা ছাড়া অন্য অভিযোগ ধারণকারী প্রমাণগুলি মোটেও বিবেচনা করেনি। যদিও, অভিযোগের বিজ্ঞাপনটি বাড়ি পোড়ানো, বেআইনি সমাবেশ ইত্যাদির মতো প্রশ্নের উপর তৈরি করা হয়েছিল, তবে এই প্রশ্নের প্রমাণগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট দ্বারা কোনও অনুসন্ধান করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ট্রায়াল কোর্ট বাড়ি পোড়ানো সম্পর্কিত সমস্ত প্রমাণকে উপেক্ষা করেছে, একমাত্র ভিত্তিতে যে পোড়া জিনিসগুলি আদালতে হাজির করা হয়নি। অন্যদিকে, আমরা নথি থেকে দেখতে পাই যে বোঝা জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যা বাজেয়াপ্ত তালিকা (প্রদর্শনী) ১) থেকে স্পষ্ট।

১৯) বেআইনি সমাবেশ এবং বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিষয়টি বিবেচনা করলে, আদালত সাধারণত নথিতে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে এই দিকগুলি নির্ধারণ করতে পারে। এই মামলায় ৩৬ জন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, অভিযুক্তরা সকলেই দলবদ্ধভাবে পি ডাবলু - ২, বাদল মালিক এবং পি ডাবলু - ৯, মান্টু মলের বাড়িতে এসেছিল এবং আই পি আর দলের লোকেরা যে বাড়িতে জড়ো হয়েছিল তা পুরোপুরি জেনেও এই বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে, আদালত এই প্রমাণ থেকে বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য কল্পনা করতে পারে। আদালত আশা করতে পারে না যে বেআইনি সমাবেশ এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের বিষয়ে পৃথক প্রমাণ উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলা প্রমাণ করবে। যদি রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানের ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি খুঁজে বের করা যায়, তাহলে আদালত কেন এটি উপেক্ষা করবে তার কোনও কারণ নেই।

২০) হাইকোর্টের দ্বারা এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা না করা, যা ছাড়া আদালতের সামনে একটি প্রশ্ন সন্তোষজনকভাবে নির্ধারণ করা যেত না, একটি গুরুতর এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রের অবিচারের দিকে পরিচালিত করেছে, যা এই আদালতের হস্তক্ষেপ এবং পুনরায় শুনানির জন্য বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে প্রেরণের নিশ্চয়তা দেয়।

আমরা দেখতে পাই যে, হাইকোর্ট বিচার আদালত হত্যা, হত্যার চেষ্টা এবং গুরুতর আঘাতের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগত প্রমাণ বাতিল করেছে কিনা এবং ঘর পোড়ানো, গুরুতর আঘাত এবং বেআইনি সমাবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে বস্তুগত প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে কিনা তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, এই দিকটিতেও, হাইকোর্ট বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় বিকৃত ছিল কিনা তা যাচাই করার জন্য তার বিচারিক মন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২১) চোখের সাক্ষ্য এবং চিকিৎসা প্রমাণের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়ে, আমাদের বিবেচনায়, হাইকোর্ট এই সত্যটি উপেক্ষা করেছে যে ধারালো অস্ত্রের সাথে আক্রমণের সময় লাঠিও ব্যবহার করা হয়েছিল। অধিকন্তু, এটি এখন সুস্পষ্ট যে চিকিৎসা প্রমাণ সাক্ষীদের চোখের সাক্ষ্যের প্রমাণকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। যদি চোখের সাক্ষ্য এবং চিকিৎসা প্রমাণের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই চোখের সাক্ষ্য প্রাধান্য পায়। অন্য কথায়, যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, সেখানে বিকল্প সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে চিকিৎসা মতামত চূড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হয় না [ইউপির অবস্থা দেখলে] বনাম কৃষ্ণ গোপাল, (১৯৮৮) ৪ এস সি সি ৩০২]। এই পর্যায়ে আমরা বিষয়টির যোগ্যতা সম্পর্কে আর কোনও মন্তব্য করতে চাই না কারণ বিষয়টি হাইকোর্টে পাঠানোর প্রয়োজন।

২২) হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ধারণ করেনি। আমরা এই সত্য সম্পর্কে সচেতন যে হাইকোর্ট কর্তৃক কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যেখানে নিম্ন আদালতের রায়ে ন্যায়বিচারের চরম অবক্ষয়, স্পষ্ট অবৈধতা বা বিকৃতি রয়েছে, হস্তক্ষেপ কেবল তখনই বৈধ হবে যদি নিম্ন আদালতের রায়ে স্পষ্ট অবৈধতা থাকে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, বিচার আদালত কর্তৃক বৈধ কারণ উপস্থাপন না করার কারণে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময়, স্পষ্ট অবৈধতা রয়েছে, এবং এইভাবে, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তিসঙ্গত বলা যাবে না। যখন কোনও স্পষ্ট ত্রুটি বা স্পষ্ট ত্রুটি থাকে যা ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে, তখন এই আদালত কেবল প্রযুক্তিগত দিকগুলিতে চোখ বন্ধ করতে পারে না, বিশেষ করে সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়। আমাদের বিবেচনায়, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার হাইকোর্ট কর্তৃক সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। বিচার আদালতের রায় নিশ্চিত করার সময় হাইকোর্টের আকস্মিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল না। রেকর্ডে থাকা উপাদান এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে, হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার আবেদন বিবেচনা করার সময় আরও গুরুতর হওয়া উচিত ছিল।

২৩. শীতলা প্রসাদ বনাম শ্রী কান্ত (২০১০) ২ এস. সি. সি ১৯০-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত যে নীতিগুলির উপর পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে তা উল্লেখ করেছে। এই আদালতের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ

"১২)হাইকোর্ট একজন ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর অনুরোধে পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করছিল এবং তাই, এই ধরণের পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগের নীতিগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা (৩) খালাসের রায়কে দোষী সাব্যস্ত করার রায়ে রূপান্তর নিষিদ্ধ করে। বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণ না করে, হাইকোর্ট কর্তৃক একজন ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) যেখানে বিচারিক আদালত ভুলভাবে প্রমাণ বন্ধ করে দিয়েছে যা রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপন করতে চেয়েছিল,

(২) যেখানে গ্রহণযোগ্য প্রমাণকে ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে,

(৩) যেখানে বিচারিক আদালতের মামলাটি বিচার করার কোনও এখতিয়ার নেই এবং এখনও অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে,

(৪) যেখানে বিচারিক আদালত বা আপিল আদালত দ্বারা বস্তুগত প্রমাণ উপেক্ষা করা হয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করে ই দ্বারা আদেশ পাস করা হয়েছে এবং

(৫) যেখানে খালাস আইনের অধীনে অবৈধ অপরাধের যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে।

১৩) এখন পর্যন্ত, এটা সুনিশ্চিত যে, যখন একজন ব্যক্তিগত অভিযোগকারী খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা এখতিয়ার আবেদন করেন, তখন তা হালকাভাবে প্রয়োগ করা যাবে না এবং এটি কেবলমাত্র সেইসব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে জনসাধারণের ন্যায়বিচারের স্বার্থে স্পষ্ট অবৈধতার সংশোধন বা ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত প্রতিরোধের জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে, অথবা অনুরূপ প্রকৃতির ক্ষেত্রে, আপিলের পুনর্বিচার বা পুনর্শুনানির আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৪) পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যেখানে ট্রায়াল কোর্ট অথবা আপিল কোর্ট কর্তৃক বস্তুগত প্রমাণ উপেক্ষা করা হয়েছে অথবা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে হাইকোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মামলার ক্ষেত্রে, বিচার আদলত বস্তুগত প্রমাণ উপেক্ষা করেছে এবং হাইকোর্ট ভুল করেছে যে সাক্ষীরা প্রথমবারের মতো আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন।আমরা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, অসঙ্গতি এবং উন্নতিগুলি ক্ষুদ্র প্রকৃতির ছিল, যেমন প্রধানত ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্ষেত্রে। বিষয়টিতে, সাক্ষীদের উপস্থিতি বিতর্কিত নয়, এবং ২৪ জন সাক্ষীর আহত হওয়ার বিষয়টিও বিতর্কিত নয়। পাঁচজনের মৃত্যুও ঘটেছে। অদ্ভুতভাবে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আঘাতগুলি অবশ্যই পদদলিত হয়ে পড়েছিল। অভিযুক্ত পদদলিত হওয়ার ঘটনায় কেবল একদল লোকেরই কেন আঘাত লেগেছে, তার কোনও কারণ নেই। সুতরাং, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা করে, প্রাথমিকভাবে পদদলিত হওয়ার তত্ত্বটিও আসামীর কাছে উপলব্ধ নাও হতে পারে। তদুপরি, হত্যা ছাড়া অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণও উপেক্ষা করা হয়েছে।

২৫) অতএব, হাইকোর্ট এই বিষয়ে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, বিচারিক আদালত খুন, হত্যার চেষ্টা এবং গুরুতর আঘাত সংক্রান্ত বিষয়ে চক্ষসাক্ষীদের সাক্ষ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপেক্ষা করেছে কিনা এবং বেআইনি জমায়েত ও বাড়ি পোড়ানোর মতো অন্যান্য অভিযোগের বিষয়ে প্রমাণ পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে কিনা। ফলে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট নথিতে থাকা প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়ন করে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে তাদের পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মতে, এই বিষয়ে হাইকোর্টের উচিত যথাযথ বিচার মনোযোগ প্রয়োগ করে মামলার উপাদানগুলি আবার বিবেচনা করা, এবং নির্ধারণ করা যে বিচার আদালতের আদেশ কি গুরুতর বিচারবিভ্রাট, স্পষ্ট বেআইনি কার্যকলাপ অথবা বিকৃতির কারণ হয়েছে কিনা।

২৬) এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই আদেশে করা কোনও পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের উপর প্রভাব ফেলবে না, কারণ হাইকোর্টকে মামলার গুণগত দিক বিবেচনা করে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এই মন্তব্যসহ, আপিলটি গ্রহণ করা হলো, হাইকোর্টের ৩০/০৬/২০০৪ তারিখে সি. আর. আর. নম্বর ৭৬৫ অব ২০০২-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাতিল করা হলো এবং মামলাটি আইনের আলোকে গুণগত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হলো।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal